'পিতামহ কথা বলো' : ভূমেন্দ্র গুহ-র জীবন ও কবিতা

রণজিৎ দাশ

কবি ভূমেন্দ্র গুহ ছিলেন মানবস্মৃতির গহনলোকের এক অদম্য অভিযাত্রী। এবং এই অভিযাত্রায় তাঁর অনিবার্য রুট-ম্যাপ ছিল তাঁর পিতৃপুরুষদের জিন-বাহিত রক্তধারার গর্বিত প্রবাহ। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'পিতামহ'। সেই গ্রন্থের 'কবিতা-ভূমিকা'-য় তিনি লিখিছেন, '...পিতামহ কথা বলো সব কথা নিতে পারি বধির অশ্রুতে/তোমার সঙ্গেই খেলব আর কারু সঙ্গে নয় এমন বিকেলে/...এসো খেল এ-রকম খেলা আমি এত বেলা এক একা খেলে/যে-বাক্য জিহ্বায় আনি তারা সব কানে কানে তোমার গলায়/কথা বলে...গায়ে কাঁটা দেয় তুমি আমার চিবুক ছুঁয়ে নিজের আঙুল/নির্ভুল আস্বাদ করো আমার আঙুল কাটো অবিশ্বাস্য দাঁতে'।—একজন কবির atavistic মানসিকতার এ এক বিরল কবিতা। এবং ভূমেন্দ্র গুহ-র আপামর কাব্যকৃতিতেই এই মানসিকতা এক মূল অবলম্বন।

আমি সর্বপ্রথমেই ভূমেন্দ্র-র কবিমানসের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলাম একারণে যে, ভূমেনদার কবিতা থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি একটি বিশেষ কথা। সেটি হল এই যে, একজন মানুষ যদি তার স্মৃতির গহনলোকে অভিযাত্রী হতে চায়, তাহলে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পথ হচ্ছে নিজের বংশধারার রক্তনদীর স্রোতে একাগ্র উজানযাত্রা। এই মনস্তাত্ত্বিক অনুমানটি ভূমেনদার কবিতার কাছে আমার এক বিশেষ প্রাপ্তি। হ্যাঁ, ভূমেন্দ্র গুহ-কে আমি ভূমেনদা বলেই ডাকতাম। একটা সময় আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছি এবং মানুষটিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেখেছি তাঁর হৃদয়ের প্রসার এবং তাঁর মেধার ঝলক। এত আন্তরিক, সহৃদয় এবং আবেগপ্রবণ মানুষ, এবং একই সঙ্গে এত শানিত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বস্তুতপক্ষে, এক প্রবল রোম্যান্টিক মন এবং এক প্রখর মেধাবী মননের দুর্লভ সন্নিপাত ঘটেছিল ভূমেনদা-র কবিমানসে। যদিও সেই সন্নিপাতের নিট্ ফল হিসেবে তাঁর কবিতায় রোম্যান্টিকতারই জয় হয়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। যার ফলে তাঁর অনিঃশেষ আবেগতাড়িত কবিতায় তাঁর শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক কবিদৃষ্টির উদ্‌বোধন কখনোই বিশেষ ঘটেনি। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও ঠিক যে, তাঁর কবিমনের এই নব্য-রোম্যান্টিক আবেগের প্রাবল্যের ফলেই তাঁর সামগ্রিক কাব্য হয়ে উঠেছে মানুষের চেতন-অবচেতনের এক অস্থির সংঘাতময় চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের কাব্যমূল্যও অনেক, এবং এর অন্তর্গত আস্তিত্বিক বিপন্নতার দৃশ্যাবলীও বাংলা কবিতায় এক নতুন উদ্‌ঘাটন।

২০০২ সালে আমি প্রথম ভূমেনদার নিকটজন হয়ে উঠি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার

নেওয়ার সুবাদে। কৃত্তিবাস পত্রিকার জন্য এই সাক্ষাৎকারটি নিতে আমাকে আদিষ্ট করেছিলেন সুনীলদা— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে এত কবি-লেখক থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি এই দুরূহ কাজটির জন্য আমার মতো দূরবর্তীকেই নির্বাচন করেছিলেন তা আজও আমার কাছে এক রহস্য। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে শিল্পে মননের জটিলতায় আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে, তাই ভূমেনদার সঙ্গে আমার জমবে ভালো। সুনীলদা ঠিকই ভেবেছিলেন। কারণ কয়েকটি পূর্বলিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে একাধিকবার ভূমেনদার বাড়িতে গিয়ে তাঁর বিশাল সাক্ষাৎকারগ্রহণের এই পর্বটি আমার জীবনের এক বিশেষ আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে প্রথমদিনেই ভূমেনদা আমাকে শুনিয়েছিলেন তাঁর পিতামহ প্রয়াত সতীশচন্দ্র গুহ রায়ের রোমহর্ষক জীবনকথা। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে মুনিনাগ গ্রামের জমিদার ছিলেন তাঁরা। অকস্মাৎ এক বিপর্যয়ে সতীশচন্দ্রের পিতামহের মৃত্যু হয়, এবং বালক সতীশচন্দ্র অনাথ হয়ে পড়েন। তখন জমিদারির অন্য শরিকেরা সম্পত্তির লোভে তাঁকে হত্যা করতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁর পূর্ববঙ্গের অনুগত কিছু জেলে-প্রজা তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যান। এরপর জেলেদের ছেলে হিসেবেই নৌকোয়-নদীতে মানুষ হন সতীশচন্দ্র। কীর্তনখোলা নদীর ধারে মৈশালী গ্রামের বড় হাটে বছরে এক-দুবার মাছ বেচতে আসতেন এই সব জেলেরা। সেই হাটে এক ধনাঢ্য বস্ত্র-ব্যবসায়ীর নজরে পড়ে যান সতীশচন্দ্র : এমন সুলক্ষণ, গৌরবর্ণ, প্রিয়দর্শন কিশোর তো কিছুতেই জেলেদের সন্তান হতে পারে না। জেলেদের কাছ থেকে সতীশচন্দ্রের আসল পরিচয় জানতে পারেন সেই বস্ত্র-ব্যবসায়ী, এবং সতীশচন্দ্রকে নিজ গৃহে নিয়ে এসে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে সতীশচন্দ্রের বিবাহ দেন।

এত আবেগের সঙ্গে এই গল্প শোনাচ্ছিলেন ভূমেনদা যে আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম নিজের পিতামহের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা আঁচ। আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম আপন বংশধারার স্মৃতির গর্বিত সরণি ধরে ভূমেনদার যুগপৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং পাগলপারা অভিযাত্রার দৃশ্যটিকে। আমার মনে পড়ছিল দার্শনিক কীয়ের্কেগার্ড-এর একটি অসামান্য উক্তি : 'ইট ইজ অ্যান আর্ট টু রিকালেক্ট।' মনে হচ্ছিল, একটা বিশেষ অর্থে, এই আর্ট-ই ভূমেনদার কবিতা। আর আমি, সেই সময়ের একাধিক উজ্জীবিত আড্ডায়, পর্যবেক্ষণ করেছিলেম ভূমেনদার আশ্চর্য মেধাবী ব্যক্তিত্বকে। দেখতে পেয়েছিলাম এমন একজন ধীমান ও তেজস্বী মানুষকে, যাঁর মননে প্রাচীন পণ্ডিতদের মতো এক নির্মোহ moral scrutiny সদাসক্রিয়, যে scrutiny-দীপ্ত মনন একজন পরিচারিকার ঘর মোছার কাজটিকেও সেই নারীর শিল্পবোধ এবং ধর্মবোধের আলোয় ব্যাখ্যা করতে পারে, এবং সম্পূর্ণ আনসেন্টিমেন্টাল-ভাবে, নিজের কবিত্বকে সেই পরিচারিকার ঘর-মোছার কাজের সঙ্গে তুলনা করতে পারে? এমন একজন প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত হৃদয়বান মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া তো ভাগ্যের ঘটনা। আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন।

এই লেখাটি আমি শেষ করবো তাঁর একটা আত্মকথা থেকে একটি আশ্চর্য উদ্ধৃতি

দিয়ে। সেটি হল একজন মানুষের হঠাৎ-কবি-হয়ে-ওঠার রহস্য বিষয়ে তাঁর এক উদ্ভুত আত্মসাক্ষ্য। তিনি লিখেছেন, 'উনিশ বছর বয়েস যখন আমার, আমি হঠাৎ কবি হয়ে গেলুম। ডাক্তারি পড়ছিলুম, অতএব হতে-যে চেয়েছি তা বলা যায় না, অপরাধটাও সেভাবে আমার নয়।... থাকি নাম ভাঁড়িয়ে তপশিলিদের জন্য গড়ে-তোলা একটা ঝরঝরে হস্টেলে, পড়ি কাছেই মেডিকেল কলেজে... আগত সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে আমার আস্তানার দিকেই আমি নিঃসঙ্কোচে হেঁটে যাচ্ছিলুম, কোনও বিপদ যে ঘটে উঠতে পারে, মনের কোণাতেও ছিল না। কিন্তু ঘটল, পরিষ্কার ছায়া-ছায়া আকাশের থেকে বড়ো-সড়ো একটা অদৃশ্য আঙুল হঠাৎই নেমে এসে আমার ঘন চুল-ভর্তি মাথার তালুতে একটা ছোট্ট টোকা মেরে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথায় একটা বিষণ্ন ভারাক্রান্ত কবিতার জন্ম হল। খুবই বিষাদগ্রস্ত কবিতা—তরুণ পুরুষকবিদের হাত থেকে যেরকম কবিতা বেরোয় আর কী! জিনিসটা একটা দানই, এই কবিতাটা—জনৈক অপরিচিত দাতার হাতের থেকে দান, এবং, এই জন্যই, একই সঙ্গে উত্তেজক এবং বিপজ্জনক।

আমার মনে হয়, প্রত্যেক কবিই এই ভাবে তাঁর সত্যিকার প্রথম কবিতাটা পেয়ে যান, স্বীকার করতে চান না, এই যা; পরিবর্তে ভারি-ভারি সব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বানিয়ে তোলেন।' ('জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে', নন্দন পত্রিকা আগষ্ট ২০১২)

ভূমেনদার মতো বিদগ্ধ, যুক্তিবাদী মানুষের মুখে নিজের প্রথম কবিতাটির জন্ম বিষয়ে এমন আধিভৌতিক উক্তি আমার কাছে অভাবনীয়। এবং তদুপরি নিজের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সকল কবির জীবনের সাধারণ সত্য হিসেবে তাঁর এই দাবি তো আরোই হতবুদ্ধিকর। অথচ পরিণত বয়সে এই উক্তিটি করছেন তিনি, স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে, দ্বিধাহীন সুচিন্তিতভাবে। যতটুকু তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, কখনোই মনে হয়নি যে তাঁর অলৌকিকে অতিপ্রাকৃতে কোনো বিশ্বাস আছে। তাঁর পক্ষে তো নিজের উনিশ বছরের সেই আবছায়া সান্ধ্য রোমাঞ্চটিকে একটি তারুণ্যের ডেলিউশন বলে উড়িয়ে দেওয়ারই কথা। তা না করে তিনি সেই অপ্রাকৃত অনুভবকে একটি মৌলিক সত্য হিসেবে ঘোষণা করলেন কেন? এই প্রশ্নটি আমাকে খুব ভাবায়। আমার মনে হয়, তিনি সংকেত রেখে গেলেন এই উপলব্ধির, যে, কাব্যরচনার পিছনে একটি অতিলৌকিক শক্তি কাজ করে, এবং সেই শক্তি কেবলমাত্র কবির নিজের দ্বারা অর্জিত নয়, সেই শক্তি আসে মহাবিশ্ব থেকে, যোগ্য গ্রহীতার মস্তক-স্পর্শ ক'রে, অলৌকিক দানের মতো।

এই উপলব্ধি বিজ্ঞান, না কুসংস্কার—তা তর্কের বিষয়। কিন্তু এই উপলব্ধি যে কবির আত্মচেতনাকে এক বৃহৎ কসমিক বোধে ও দায়িত্বে সংলগ্ন করে, সে কথা তর্কাতীত।